পরিক্রমা

নামৈব কেবলম্

ভগবানের লীলা অচিন্তনীয়। মানুষের রূপে এসে তাঁরা মানুষেরই জয়গান করে যান। বলেন, ''মানুষ কি কম গা?'' অর্থাৎ মানুষ ভিন্ন অন্য কোনও সৃষ্ট জীব ঈশ্বরচিন্তা করতে পারে না। শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতাযুগে লক্ষ্মণকে বলেছিলেন, ''ভাই হাতি অত বড় জন্তু কিন্তু ঈশ্বরচিন্তা করতে পারে না।'' মানুষ শুধু দেহমাত্র নয়, তার একটি মন আছে। এই মন যার মননশীল সেই বেঁচে থাকে :

''তরবোঽপি জীবন্তি জীবন্তি পশুপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥''

সে-মন যেমন স্থূল ইন্দ্রিয়ের অনুসরণে ভোগের দিকে ছুটতে পারে তেমনি অন্তর্মুখী মন খুঁজতে পারে অন্তর্যামী অন্তরশায়ী চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে। তাই উপনিষদে শুনি, 'আবৃত্তচক্ষুঃ অমৃতত্বমিচ্ছন্'। আবৃত্তচক্ষুর অর্থ, মন যার বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত। অমৃতলাভের ইচ্ছায়, মরণজয়ের যাত্রায় জীবের উত্তরণ ঘটে। সে স্বরূপকে ফিরে পেতে চায়। এইজন্যই বেদ-উপনিষদ ও পুরাণ একযোগে অমৃতের পুত্রদের জন্য নানা সুরে, নানা ভাষাবন্ধে ঘোষণা করেছেন সেই 'পুরুষং মহান্তম্'-এর মহিমা। মন যখন মননের দ্বারা বিষয়বুদ্ধি সংযত করে লক্ষ্যে ধাবিত হয় তখনই সে সার্থক। জীবচেতনার উদ্বোধনের জন্যই শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ পাঁচশো বছরের ব্যবধানে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভারত পুণ্যভূমি। এখানকার অণুপরমাণুতে ত্যাগ-বৈরাগ্যের সুর। এ সাধুসন্তের দেশ। ধর্মভাবের জমাট কেন্দ্র। ঈশ্বরকে সম্বল করে আজকের দিনেও কত মানুষ দিনযাপন করেন। তবে এযুগে ভোগবাদের তীব্র স্রোতে যেন জীবনভাবনা স্বার্থকেন্দ্রিক ও লক্ষ্যচ্যুত। আবিলতার ঘূর্ণিঝড় বইছে। মনে হচ্ছে আমাদের চিরাচরিত ধ্যানধারণা বিরুদ্ধশক্তির তীব্র সংঘাতে বিচলিত ও ক্ষুব্ধ। ভারতের এই দোলাচল অবস্থার শুরুতেই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। ভগবান শ্রীচৈতন্য মধ্যযুগে ভগবানের নামকীর্তনের যে-শিক্ষা দিয়েছিলেন, আজকের সমাজের অধিকাংশ মানুষ আধুনিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানের অভিযাত্রী হয়ে আগেকার সেই নিষ্ঠা জীবনে ধরে রাখতে অক্ষম। তিনি ছিলেন ভক্তির অবতার। ত্যাগ-বৈরাগ্যের সঙ্গে ভগবৎপ্রেমের সচল বিগ্রহ। এক অপূর্ব ভাগবত জীবনকে তিনি তুলে ধরেছিলেন। তাঁকে ঘিরে সমাজের জাতপাতের দৃঢ় বন্ধন শিথিল হয়েছিল। ভগবদ্‌ভক্তিতে আপ্লুত হয়েছিল ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র, চণ্ডাল ও নিম্নবর্ণের মানুষজন। এক-এক অবতারের লীলা কালের উপযোগী হয়ে প্রকাশিত হয়। ভাগবতপুরাণের একটি অনাস্বাদিত অধ্যায় ছিল রাসলীলা। এই অধ্যায়ের নিগূঢ় রহস্য এবং তাৎপর্য শ্রীচৈতন্যজীবনে রূপ নিয়েছিল। গম্ভীরায় সে-লীলার মর্ম তিনি অনুধ্যান করতেন। সেই উচ্চভাবের ধারণা সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন। তাই সুনির্বাচিত রসজ্ঞ রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর ছিলেন সেই ভাবগ্রহণের দুর্লভ সঙ্গী। গম্ভীরার সেই গম্ভীর লীলা ঘটত একান্তে। কিন্তু সাধারণের জন্য ছিল নামসংকীর্তন। ভগবানের নামের মাহাত্ম্যের কথা তিনি একটি শ্লোকবন্ধে রচনা করেছিলেন :

''নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতস্মরণেন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমহো ইহাজনি নানুরাগঃ॥''

—হে ভগবান, আপনার কত নাম! আপনি জানেন ওইগুলির প্রত্যেকটির কী তাৎপর্য! সব নামগুলিই আপনার। প্রত্যেক নামেই আপনার অনন্ত শক্তি। এইসব নাম উচ্চারণের কোনও নির্দিষ্ট দেশ-কালও নেই, কারণ সব কালই শুদ্ধ ও সব স্থানই শুদ্ধ। আপনি এত সহজলভ্য, এত দয়াময়! তবু আমি অতি দুর্ভাগা যে, আপনার প্রতি আমার অনুরাগ জন্মাল না!

নাম ও নামী অভেদ। আদর ও একান্ত ভালবাসার সঙ্গে উচ্চারিত নাম শুনলে নামী থাকতে পারেন না। যেখানে নামের সঙ্গে নামীর এমন অদ্ভুত যোগ, সেখানে সেই সহজ নাম কেন আমরা গাইতে, জপ করতে পারি না? ঈশ্বরীয় নাম স্মরণের অনন্ত মাহাত্ম্য কীর্তিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষ সে-নাম বিস্মৃত হয়। ঈশ্বর যে-জিহ্বা দিয়েছেন সে-রসনা সার্থক হয় সচ্চিদানন্দের গুণগানে। মুকুন্দমালাস্তোত্রে কবি দুঃখ করে বলছেন,

''আনন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ রাম
নারায়ণানন্ত নিরাময়েতি।
বক্তুং সমর্থোঽপি ন বক্তি কশ্চিৎ
অহো জনানাং ব্যসনানি মোক্ষে॥''

—ভগবানের আনন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ ইত্যাদি নাম বলতে সমর্থ হলেও কেউ বলে না! হায়, মানুষের মুক্তিলাভে কী বিষম অন্তরায়!

শ্রীরামকৃষ্ণও গাইতেন, ''রোগে বাঁচি কি না বাঁচি ত্বন্নামে অরুচি দিবাশর্বরী।'' নামে অরুচি হলে ভবরোগ থেকে বাঁচার উপায় নেই।

পাণ্ডবগীতায়ও বলা হয়েছে :

''হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥''

—হরিনাম, হরিনাম, কেবল হরিনামই সব। কলিতে অন্য কোনও গতি নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ অবতাররূপে উনিশ শতকের নবীন পটভূমিতে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু নামের মহিমা তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে এখানেও স্থির রইল। ভগবানের নামজপের কোনও বিকল্প আজও নেই। তাঁর মুখেই শুনি, ''এক রাম তাঁর হাজার নাম।'' গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণীতেও আমরা শুনি, মানুষ যে-ভাব নিয়ে তাঁর উপাসনা করে তিনি সেই ভাবেই তাকে গ্রহণ করেন। ''যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'' বৈদিক যুগে ওঙ্কারকে পরব্রহ্মের বাচক বলা হয়েছে। সেই ওঙ্কারসাধনা আজও বহু সাধক করে চলেছেন। ঈশ্বরের যে-কোনও নাম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে জপ করলে তার ফল অবশ্যম্ভাবী। শ্রীচৈতন্যদেব সাধারণ মানুষের জন্য উচ্চরোলে হরিনামসংকীর্তন প্রবর্তন করলেন। 'হাতে কাজ কণ্ঠে বোল'—এই হয়েছিল সাধারণ মানুষের জীবনচর্যা। সেইসঙ্গে তৃণদলের মতো নম্রতা, তরুর মতো সহিষ্ণুতা এবং অপরকে মানদান।

শ্রীরামকৃষ্ণের পরমানন্দে নামগুণগানের কথা এযুগে নতুন করে ভক্তেরা শুনেছেন। তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন তিনপ্রকার আনন্দের কথা। একটি বিষয়ানন্দ—পঞ্চেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি : শোনার বাসনা, দেখার প্রবণতা ইত্যাদি—সাধারণ মানুষ যার পিছনে ছোটে। দ্বিতীয়—ভজনানন্দ। ভগবানের নামগুণগান করে যে-আনন্দ। তৃতীয়টি হল—ব্রহ্মানন্দ। সেই পরমানন্দ ব্রহ্মের অনুভবে যে-আনন্দ উথলে পড়ে। তিনিও ভক্তদের বলতেন হাততালি দিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় হরিনাম করতে। ওইভাবে দেহবৃক্ষে বহু চিন্তার পাখিগুলি উড়ে পালায়। নিদ্রাভঙ্গের পর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বমুখে গীতা-গঙ্গা-গায়ত্রী ও ভগবানের নানা নাম উচ্চারণ করতেন। নামের সুরেই দিন-রাত বাঁধা হত। ভগবানের নাম গ্রহণমাত্রই দেহস্থ বায়ু ঊর্ধ্বগামী হয়। শ্রীচৈতন্যের জীবনে এই নামসংকীর্তন, কীর্তনের রোল এক অভূতপূর্ব রূপ নিত। জগন্নাথের আলয়ে তাঁর মন্দির প্রদক্ষিণ করে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য

হরিধ্বনি করতেন—

''চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে সংকীর্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন॥...
কীর্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল।
চতুর্দশ লোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল॥''

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা)

সেই ''মহানৃত্য মহা-প্রেম মহা-সংকীর্তন।
দেখি মহানন্দে ভাসে নীলাচলের জন॥''

(তদেব)

দীর্ঘদিন লোকলোচনের অন্তরালে মহাপ্রভু মহাভাবে গম্ভীরায় লীলা আস্বাদনে নিমগ্ন থাকলেও মাঝে মাঝেই, বিশেষ করে রথযাত্রার সময়ে ভক্তদের নিয়ে সংকীর্তনের লীলাবিলাস ভক্তচিত্তকে প্রেমানন্দে অধীর করে তুলত।

এযুগের লীলায় শ্রীরামকৃষ্ণ উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভক্তদের সেই নামসংকীর্তনের উন্মাদনা চাক্ষুষ করাবার জন্য অসুস্থ শরীরেও পানিহাটির মহোৎসবে যোগদান করেছিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁর বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্ত। ভক্তগণ ভাবান্তর দেখে তাঁকে বেষ্টন করে দাঁড়ালেন। অর্ধবাহ্যদশায় তাঁর মনোহর নৃত্য—তিনি দ্রুতপদে তালে তালে অগ্রসর হলেন, কখনও বা পিছিয়ে আসতে লাগলেন। সেইসঙ্গে তাঁর অঙ্গসঞ্চালনে যেন মাধুর্যসিন্ধু উথলে উঠল। প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী সারদানন্দ মহারাজের ভাষায় : ''প্রবল ভাবোল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া তাঁহার দেহ যখন হেলিতে দুলিতে ছুটিতে থাকিত তখন ভ্রম হইত উহা বুঝি কঠিন জড় উপাদানে নির্মিত নহে...।'' তাঁর দেবদেহের পরিবর্তনও ভক্তদের বিস্মিত করেছিল : 'অনেক দীর্ঘ এবং স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের ন্যায় লঘু,' 'শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়া গৌরবর্ণে পরিণত...''। তাঁর সেই শ্রীমূর্তি দর্শনে বিহ্বল কীর্তনসম্প্রদায় গান ধরলেন—

''সুরধুনীর তীরে হরি বলে কে
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।''

ফেরার সময় তিনি যুবক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আজ কেমন দেখলি বল দেখি? যেন হরিনামের হাটবাজার বসে গিয়েছে—না?''

নামের ভেতর নামী না থাকলে সে-নাম কি এত মধুময় হতে পারে? শ্রীচৈতন্যদেবের ঈশ্বরপ্রেমে ঢলঢল মূর্তি এবং তাঁর বিপুল নামসংকীর্তনের স্রোতটি এসে মিশেছিল এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলায়। পুঁথিকার গেয়েছেন :

''মহোৎসবে রীতি যথা হরি-সংকীর্তন।
আরম্ভ করিল তবে যত ভক্তগণ॥
মাতিলেন প্রভুদেব আর কেবা রাখে।
নাচিতে গাহিতে বাহ্য যায় থেকে থেকে॥
কোথা তিনি কোথা বাস সরম ভরম।
ঠিক নাই ভক্তে করে শ্রীঅঙ্গ রক্ষণ॥
সংকীর্তনে শ্রীপ্রভুর সংযোগ তেমতি।
কমলের বনে যেন মদমত্ত হাতী॥
সুকোমল অঙ্গে বহে উচ্চতম বল।
শ্রীচরণ-চাপে ধরা করে টলমল॥
যেন কত মহোল্লাসে সঙ্গে নৃত্য করে।
কমলা-সেবিত পদ পেয়ে বক্ষোপরে॥
যদি বল জড় ধরা নাচিল কেমনে।
সকল সম্ভব এই রামকৃষ্ণায়নে॥...
দূরে থাক পরিধান-বাসের খবর।
নাহি গ্রাহ্য আপনার অঙ্গ কলেবর॥
সংকীর্তনে শ্রীপ্রভুর অপূর্ব নৃত্যন।
ঘন ঘন সমাধিস্থ দেহ-ছাড়া মন॥
লোকাতীত মহাভাব শাস্ত্রে যাহা শুনা।
প্রত্যক্ষ দেখিতে করে সকলে বাসনা॥
অনিমিখে যত লোকে করে নিরীক্ষণ।
অপূর্ব প্রেমের ছবি মন বিমোহন॥''

অবিরাম ভগবৎপ্রসঙ্গের সঙ্গে ভাবানুষঙ্গী সংগীত ও নামসংকীর্তনে তিনি আনন্দের হাটবাজার সৃষ্টি করতেন। সে-আসরে থাকতেন কলকাতার

স্কুল-কলেজের ছেলেরা এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। থাকতেন ব্রাহ্মসমাজের শীর্ষস্থানীয়গণ—কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ। এই একটি পরিচিত ধারায় সকলেই যোগদান করতে পারতেন। উচ্চ ভাবতরঙ্গে তাঁরা আপ্লুত হতেন। শুধু শ্রীম কেন—সকল ভক্তই যখন গৃহে ফিরতেন অনুভব করতেন সংকীর্তনের নামের ফুট চিত্তে বারবার ভেসে উঠছে। দক্ষিণেশ্বরকে কেন্দ্র করে কলকাতার নানা স্থানে তাঁর সংকীর্তনের মাধুরী মানুষকে আকর্ষণে বিহ্বল করেছিল। তাঁর পুণ্য আবির্ভাবস্থল কামার-পুকুরের নিকটস্থ ফুলুই-শ্যামবাজার এবং বেলডিহা অঞ্চলেও নামসংকীর্তনের এক অপূর্ব লীলা সংঘটিত হয়। মহাপ্রভুর মহা আকর্ষণী সংকীর্তনলীলার যেন পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। সাগরের মতো ভগবৎ-নামতরঙ্গে ভাসমান সেই স্থানগুলির মানুষজন ভাবে উন্মত্ত হয়ে দিবারাত্র তাঁকে বেষ্টন করে থাকতেন। সেই লীলাবিলাসের কথাচিত্রই আমরা শুনি। মানুষের মনে কিন্তু তার প্রচণ্ড আকর্ষণী ও উন্মাদিনী শক্তির প্রভাব দীর্ঘদিন জাগ্রত ছিল।

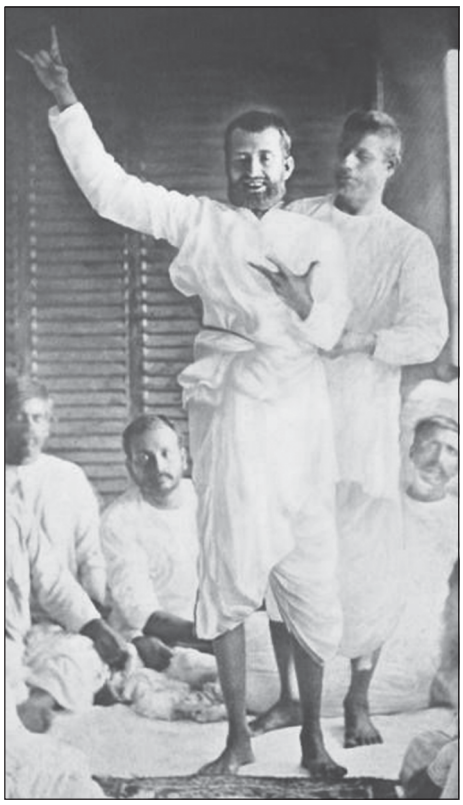

শ্রীরামকৃষ্ণ

স্মরণমননের সহজ পন্থা ভগবানের নাম ও তাঁর অনন্ত গুণাবলির কীর্তন। ''ঈশ্বরে কী করে মন হয়?'' এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ''ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে হয়।'' তার সঙ্গে আরও বলেছিলেন, মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা, সর্বদা সদসৎবিচার ও সাধুসঙ্গের কথা। তাঁর নামে মন একবার মজলে পরপর সবেরই যোগাযোগ হয়। নাম যখন মধুবর্ষণ করে তখন মনের কাছে বিষয়মধু তুচ্ছ হয়ে যায়। এই সহজ বিধান শ্রীচৈতন্যও দিয়েছেন—'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'। শ্রীহরির কীর্তনে মনের যত কালি ধুয়ে মুছে যায়, অনায়াসে শুদ্ধ ও শান্ত হয় চঞ্চল মন। শুধু ভগবানের নামের বলেই মনঘড়ির কাঁটা ঘুরতে শুরু করে প্রার্থিত পথে। কথাপ্রসঙ্গে ভক্তদের শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ''সংসার করবে অথচ মাথার কলসী ঠিক রাখবে অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে মন ঠিক রাখবে।'' আবার তার সঙ্গে বলছেন, 'অভ্যাস চাই', 'হুঁশিয়ার হওয়া চাই'।

নাম-সাধনার ফল নামেরই অনুরণন। এই জপমাহাত্ম্যের ফলে শোনা যায় মহারাষ্ট্রের এক ভক্তের শবদেহের অস্থিতেও 'বিঠ্ঠল' নামের জপধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন ভক্তেরা।

এই নামরূপের জগতকে জয় করতে ভগবানের নাম ও রূপই মহাস্ত্র। যুগে যুগে তাই নাম-সংকীর্তনের আনন্দ দিয়ে অবতার জগজ্জাল ভেদ করার মন্ত্র দেন। কীর্তনানন্দে ভাসমান সেই প্রেমময় কৃপাময় আনন্দময় শ্রীচৈতন্যস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে শতকোটি প্রণাম।